ইসলামি ই-বুক সিরিজ – ১

ইসতিখারার সুন্নত তরিকা

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি

আলী হাসান উসামা

অনূদিত

হামদ এবং সালাতের পর...

قال عبد الله بن عمر : (إن الرجل ليستخير الله فيختار له ، فيسخط على ربه ، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خار له)

হাদিসটির উদ্দেশ্য

উপরিউক্ত বর্ণনাটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর উক্তি।[১] তিনি বলছেন, অনেক সময় মানুষ আল্লাহ তাআলার কাছে ইসতিখারা করে— আমার জন্য যে বিষয়টি কল্যাণকর, তা-ই যেনো হয়। তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য সে বিষয়ের ফায়সালা করেন, যা তার জন্য কল্যাণকর। বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক সময় বান্দার কাছে ফায়সালাকৃত বিষয়টির কল্যাণ ও যথার্থতা বোধগম্য হয় না। তখন সেই বান্দা নিজ প্রতিপালকের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। সে তখন মন্তব্য করে বসে, আমি তো আল্লাহকে এ কথা বলেছিলাম যে, আমার জন্য কল্যাণকর বিষয় স্থির করে দিন। এখন নসিবে যা জুটলো, তা তো আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না। উপরন্তু এতে তো আমার জন্য আরো কষ্ট এবং পেরেশানি। এরপর কিছুকাল পরে যখন পরিণতি সামনে আসে, তখন তার বোধগম্য হয় যে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে ফায়সালা করেছিলেন, সেটাই তার ক্ষেত্রে উত্তম এবং কল্যাণকর ছিলো। প্রথমে বিষয়টি তার বোধগম্য হয়নি। তখন সে ভেবেছে, আমার প্রতি জুলুম এবং অন্যায় করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার ফায়সালার যথার্থতা কখনো দুনিয়ায় প্রকাশিত হয় আর কখনো তার যথার্থতা দুনিয়ায় প্রকাশিত হয় না। এই অপ্রকাশিত বিষয়ও ইনশাআল্লাহ তা আখিরাতে প্রকাশ পাবে।

এই বর্ণনার আলোকে কয়েকটি বিষয় আলোচনার দাবি রাখে, যে বিষয়গুলো ভালো করে বুঝে নেয়া উচিত। প্রথম কথা হলো, কোনো বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে ইসতিখারা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য কল্যাণের ফায়সালা করে দেন। ইসতিখারা কাকে বলে? এ বিষয়ে সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষের ধারণা, ইসতিখারা করার জন্য নির্দিষ্ট তরিকা এবং নির্দিষ্ট আমল রয়েছে। নির্দিষ্ট পন্থায় ইসতিখারা করা হলে এরপর কোনো স্বপ্ন দেখা যায়। সেই স্বপ্নে নির্দেশনা দিয়ে দেয়া হয়, অমুক কাজ করো কিবা তা করা থেকে বিরত থাকো। খুব ভালো করে বুঝে নিন, রাসুলুল্লাহ সা. এর থেকে ইসতিখারার যে সুন্নত তরিকা প্রমাণিত রয়েছে, তার মধ্যে এ ধরনের কোনো বিষয়ই নেই।

ইসতিখারার তরিকা এবং তার দোয়া

ইসতিখারার সুন্নত তরিকা হলো, ইসতিখারার নিয়তে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়া হবে। নিয়ত এভাবে করবে, আমার সামনে দুটো পথ খোলা রয়েছে। এ দুটোর মাঝে আমার জন্য যেটা কল্যাণকর হবে, আল্লাহ তাআলা তার ফায়সালা করে দিন। এরপর দু'রাকাত নামাজ পড়বে। নামাজের পরে রাসুলুল্লাহ সা. থেকে নির্দেশিত দোয়া পাঠ করবে। এ এক বড় আশ্চর্যজনক দোয়া। এমন দোয়া শুধু নবির পক্ষেই করা সম্ভব। অন্য কারো

[১] কিতাবুয যুহদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.; যিয়াদাতুয যুহদ, নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ রহ., রিযা বিল কাজা অধ্যায়, পৃষ্ঠাঃ ৩২

সাধ্য নেই এমন অভিনব দোয়া তৈরি করা। যতোই চেষ্টা করা হোক, কিছুতেই এমন দোয়া করা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়— যা নবিজি সা. তার উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন। দোয়াটি নিম্নরূপ—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

দোয়ার অনুবাদ

হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলমের ওসিলা দিয়ে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আপনার কুদরতের ওসিলা দিয়ে আপনার কাছে কল্যাণমূলক কাজের সক্ষমতা প্রার্থনা করছি। আপনি গায়ব সম্পর্কে জ্ঞাত। হে আল্লাহ, আপনি সব জানেন আর আমি কিছুই জানি না। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার জন্য কল্যাণকর না অকল্যাণকর— সেই জ্ঞান আপনার আছে, কিন্তু আমার নেই। আপনার কুদরত রয়েছে আর আমার মধ্যে কোনো কুদরত-সক্ষমতা নেই। যদি আপনার ইলমে এটা থাকে যে, এই বিষয়টি (ওপরের প্রথম আন্ডারলাইন করা জায়গাটির অনুবাদ। এখানে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি কল্পনায় আনবে।) আমার জন্য কল্যাণকর, আমার দীনের জন্য কল্যাণকর, আমার জীবনধারা এবং দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর এবং পরিণতির বিচারেও কল্যাণকর, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন, আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার জন্য তাতে বরকত সৃষ্টি করে দিন। আর যদি আপনার ইলমে এটা থাকে যে, এই বিষয়টি (ওপরের দ্বিতীয় আন্ডারলাইন করা জায়গাটির অনুবাদ। এখানে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি কল্পনায় আনবে।) আমার জন্য মন্দ, আমার দীনের জন্যও মন্দ, আমার জীবনধারা এবং দুনিয়ার জন্যও মন্দ, পরিণতির বিচারেও মন্দ, তাহলে আমার থেকে তা সরিয়ে দিন এবং আমাকেও তা থেকে সরিয়ে রাখুন আর আমার জন্য কল্যাণকর বিষয় নির্ধারিত করুন, তা যেখানেই হোক। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার জন্য তাতে বরকত সৃষ্টি করে দিন। অর্থাৎ এ বিষয়টি যদি আমার জন্য কল্যাণকর না হয়, তাহলে তা হটিয়ে দিন এবং তার স্থলে যা কল্যাণকর হবে, আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দিন। এরপর আমাকে সে বিষয়টির প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন এবং আমার অন্তর প্রশান্ত করে দিন।

দু রাকাত নামাজ পড়ার পরে এই দোয়া করে নিলেই ইসতিখারা হয়ে যায়।

ইসতিখারার কোনো সময় নির্ধারিত নেই

কেউ কেউ মনে করেন, ইসতিখারা সর্বদা রাতে শয্যাগ্রহণের সময়ই করতে হয়, কিবা এশার নামাজের পরেই করতে হয়। এমন কোনো কিছুই জরুরি নয়। বরং যখনই সুযোগ হয়, এই ইসতিখারা করে নেয়া যায়। না রাতের কোনো শর্ত আছে, আর না দিনের। না শয়নের কোনো শর্ত আছে, আর না জাগরণের।

স্বপ্ন দেখা জরুরি নয়

কারো কারো ধারণা, ইসতিখারা করার পরে কোনো স্বপ্ন দেখবো, স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদেরকে অবগত করা হবে, এই কাজ করো অথবা তা করা থেকে বিরত থাকো। স্মরণ রাখবেন, স্বপ্ন দেখা কোনো জরুরি বিষয় নয়। স্বপ্নে অবশ্যই কোনো নির্দেশনা দেয়া হবে বা অন্তত কোনো একটা ইঙ্গিত দেয়া হবে— এটা আবশ্যক কিছু নয়। কখনো স্বপ্ন আসে আর কখনো তা আসে না।

ইসতিখারার ফলাফল

কোনো কোনো ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, ইসতিখারা করার পরে মানুষের অন্তর একদিকে ঝুঁকে যায়। অন্তর যেদিকে ঝোঁকে, সে কাজের সিদ্ধান্তই নিতে হয়। হাঁ, অনেকসময়ই অন্তরে এই ঝোঁক সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা কোনো জরুরি বিষয় নয়। একান্ত অন্তর কোনো দিকে যদি না ঝোঁকে, বরং তাতে দোদুল্যমানতা থেকেই যায়, তখনও ইসতিখারার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। কেননা ইসতিখারা করার পরে আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য সে ফায়সালাই করে, যা তার জন্য কল্যাণকর। এরপর অবস্থাই এমন সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তা-ই সংঘটিত হয়, যার মধ্যে বান্দার জন্য প্রভূত কল্যাণ লুকায়িত রয়েছে। প্রথম থেকে সে বিষয়ে তার ধারণাও থাকে না। কখনো মানুষ কোনো এক পথকে খুব উত্তম মনে করে, কিন্তু হঠাৎ দেখা যায়, সেই পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সেই পথ থেকে সরিয়ে নেন। ইসতিখারার পরে আল্লাহ তাআলা আসবাব-উপকরণগুলোকে এমনভাবে সৃষ্টি করে দেন, তখন তা-ই ঘটে, যার মধ্যে বান্দার জন্য কল্যাণ লুকায়িত রয়েছে। এখন কল্যাণ কিসের মাঝে? মানুষ তা জানে না, কিন্তু (ইসতিখারার মাধ্যমে) আল্লাহ তাআলা তার জন্য কলাণ নির্ধারিত করে দেন।

তোমার জন্য এটাই কল্যাণকর ছিলো

যখন সেই কাজটি হয়ে যায়, তখন কোনো কোনো সময় এমনটা মনে হয়, যা হয়েছে বাহ্যত তা মঙ্গলজনক মনে হচ্ছে না, অন্তরের দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণও বোধ হচ্ছে না। এই অবস্থায় বান্দা আল্লাহ তাআলার কাছে অভিযোগ জানায়, হে আল্লাহ! আমি তো আপনার সঙ্গে মশওয়ারাহ ইসতিখারা করেছিলাম। কিন্তু কাজ তো তা-ই হলো, যা আমার মর্জি এবং তবিয়তের সম্পূর্ণ বিরোধী। যা হলো, বাহ্যত তা-তো মঙ্গলজনক মনে হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলছেন, আরে বোকা! তুই তোর সীমাবদ্ধ বিবেক দ্বারা ভেবে নিয়েছিস, তোর জন্য এই বিষয়টি মঙ্গলজনক হয়নি। কিন্তু যার ইলমের অধীনে সমগ্র বিশ্বের পরিচালনার জ্ঞান, তিনি ভালো করেই জানেন, তোর জন্য কোনটা কল্যাণকর ছিলো আর কোনটা অকল্যাণকর ছিলো। তিনি যা করেছেন, তোর জন্য সেটাই কল্যাণকর ছিলো। কোনো কোনো সময় তো দুনিয়ায়ই জানা হয়ে যায়, আদতে কোনটা তোর জন্য কল্যাণকর ছিলো আর কখনোবা সারাটা জীবনে ফায়সালাকৃত বিষয়ের যথার্থতা বোধগম্য হয়ে ওঠে না। এরপর যখন আখিরাতে গমন করবি, তখন সেখানে গিয়ে বুঝতে পারবি, আদতে ফায়সালাকৃত বিষয়টিই তোর জন্য কল্যাণকর ছিলো।

তুমি শিশুর মতো

এর দৃষ্টান্ত এভাবে বোঝো। একটি শিশু আহ্লাদে লাফাচ্ছে। মা-বাবার কাছে বায়না ধরে বসেছে, আমি অমুক জিনিসটা খাবোই। মা-বাবা জানেন যে, এই অবস্থায় বাচ্চাকে তা খাওয়ানো হলে স্বাস্থ্যের বেশ ক্ষতি হবে। তখন মা-বাবা বাচ্চাকে সেই জিনিসটা খেতে দেয় না। এখন নির্বুদ্ধিতার কারণে বাচ্চা এটা বুঝে নেয়, আমার মা-বাবা আমার প্রতি জুলুম করেছে। আমি যে জিনিসটা এতো করে চাইলাম, আমাকে তা দিলো না। তার বদলে উল্টো বরং কী সব তিতা তিতা ওষুধ খাওয়াচ্ছে। সেই শিশুটি এখন ওষুধকে নিজের জন্য উত্তম মনে করছে না, কিন্তু বড় হওয়ার পর যখন আল্লাহ তাআলা তাকে আকল এবং বোধশক্তি দান করবেন এবং সঠিক বিষয়টি তার বোধগম্য হবে, তখন সে টের পাবে আর ভাববে, আমি তো নিজের জন্য মৃত্যুর বায়না ধরেছিলাম। আর আমার মা-বাবা আমার জন্য সুস্থ সুন্দর জীবনের পথ সন্ধান করছিলেন।

আল্লাহ তাআলা তো বান্দার ওপর মা-বাবার থেকেও অধিক মেহেরবান। এজন্য আল্লাহ তাআলা সে পথ নির্বাচন করেন, যার পরিণতি বান্দার জন্য কল্যাণকর হয়। এরপর কখনো তার যথার্থতা দুনিয়ায়ই বোধগম্য হয়ে যায় আর কখনোবা দুনিয়ার যিন্দেগিতে তা অবোধগোম্যই থেকে যায়।

হযরত মুসা আ. এর একটি ঘটনা

আমার শায়খ ডা. আব্দুল হাই আরেফি রহ. একবার একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। ঘটনাটি আমি শুধু তাঁরই কাছে শুনেছি। কোনো কিতাবের পাতায় চোখে পড়েনি। কিন্তু কোনো কিতাবে অবশ্যই তা বর্ণিত হয়ে থাকবে। ঘটনাটি নিম্নরূপ—

মুসা আ. যখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলার জন্য তুর পাহাড় অভিমুখে তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক ব্যক্তি মুসা আ. কে বললো, হযরত! আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথনে ধন্য হওয়ার জন্য আপনি তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার জন্য এরচে মোক্ষম সুযোগ আর কীইবা হতে পারে! এজন্য যখন আপনি সেখানে পৌঁছবেন, আমার জন্যও দোয়া করে আসবেন। কেননা আমার জীবনে অনেক বিপদাপদ। মাথার ওপর দায়-দায়িত্বের এক পাহাড়ও চড়ে আছে। দারিদ্রপীড়িত এক অসহায় মানুষ আমি। বিভিন্ন ধরনের পেরেশানিতে আক্রান্ত। আমার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে এই দোয়া করবেন, তিনি যেনো আমাকে সুখ এবং সচ্ছলতা দান করেন। হযরত মুসা আ. তাকে আশ্বস্ত করে প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক বললেন, ঠিক আছে। সুন্দর আবেদন। আমি তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করবো।

যাও, আমি তাকে সচ্ছলতা দান করলাম

মুসা আ. যখন তুর পাহাড়ে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হলেন। কথোপকথন শেষে মুসা আ. এর সেই লোকটির কথা স্মরণ এলো, যে তাকে দোয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলো। তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনার এক বান্দা অমুক শহরে বসবাস করে। তার নাম এই। সে আমাকে বলেছিলো, যখন আমি আপনার সামনে উপস্থিত হবো, তখন যেনো আপনার সামনে তার পেরেশানিগুলোর কথা উল্লেখ করি। হে আল্লাহ! সেও আপনার বান্দা। আপনি আপনার দয়ায় তাকে সুখ-শান্তি দান করুন; যাতে করে তার জীবনেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চলে আসে, সকল বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। তাকেও আপনার নেয়ামতে পরিপুষ্ট করুন। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, হে মুসা! তাকে স্বল্প নেয়ামত দেবো নাকি অধিক দেবো? হযরত মুসা আ. ভাবলেন, আল্লাহর কাছেই যখন চাচ্ছেন, তখন কম কেনো চাইবেন! এজন্য তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে বললেন, নেয়ামত যখন দিবেনই, তখন বেশি করেই দিন। আল্লাহ তাআলা বললেন, যাও, আমি তাকে অধিক নেয়ামতই দান করলাম। হযরত মুসা আ. এর অন্তর প্রশান্ত হয়ে গেলো। এরপর তিনি তুর পাহাড়ে নির্ধারিত মেয়াদ অবস্থান করলেন।

সারা দুনিয়াও তো স্বল্প

তুর পাহাড় থেকে যখন ফিরছেন, তখন সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ এলো। তখন ভাবলেন, গিয়ে তাকে একটু দেখে আসবেন, এখন বেচারা কোন অবস্থায় আছে। আল্লাহ তাআলা তো তার ব্যাপারে দোয়া কবুল করেছেন। মুসা আ. তখন তার ঘরে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে অপর এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলো। মুসা আ. বললেন, আমি অমুক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাচ্ছি। তখন সে বললো, উনি তো ইন্তেকাল করেছেন বেশ কদিন হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কবে তার ইন্তেকাল হয়েছে? সে উত্তর দিলো, অমুক দিন অমুক সময়ে ইন্তেকাল হয়েছে। মুসা আ. সময়টা ভেবে অনুধাবন করলেন, যে-দিন যে-সময়ে তিনি আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করেছেন, তার কিছু সময় পরই এই বেচারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। তখন মুসা আ. খুব পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! এ বিষয়টি তো আমার বোধে ধরছে না। আমি তার জন্য সুখ সচ্ছলতা এবং অবারিত নেয়ামত প্রার্থনা করলাম আর আপনি তার জীবনেরই যবনিকাপাত করলেন! আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি তো তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাকে স্বল্প নেয়ামত বেশি দেবো নাকি অধিক নেয়ামত প্রদান করবো? তুমি বলেছিলে, অধিক দিন। আমি যদি তাকে সারা দুনিয়ার অধিকারী বানিয়ে দিতাম, তবে তা-ও তো স্বল্পই। এখন আমি তাকে আখিরাত এবং জান্নাতের যে নেয়ামত প্রদান করেছি, তার ব্যাপারে বাস্তবেই এ কথা প্রযোজ্য যে, তা অধিক নেয়ামত। দুনিয়ায় থেকে অধিক নেয়ামতের অধিকারী হওয়া তার পক্ষে সম্ভবই ছিলো না। এজন্য আমি তাকে আখিরাতের নেয়ামত দান করেছি।

মানুষ তার সীমাবদ্ধ বিবেক দ্বারা আল্লাহ তাআলার ফায়সালার মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য কীভাবে বোধ করবে?! একমাত্র তিনিই জানেন, কোন বান্দার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি কল্যাণকর। মানুষ বাহ্যিক কিছু বিষয় দেখে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে বসে, আল্লাহর তাআলার ফায়সালাকৃত বিষয়কে অমঙ্গলজনক জ্ঞান করতে শুরু

করে। অথচ হাকিকত তো এই যে, কার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি মঙ্গলজনক— সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার থেকে আর কেইবা উত্তম ফায়সালা ভালো করতে পারে?!

ইসতিখারা করার পরে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও

এ কারণেই উপরিউক্ত হাদিসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলছেন, যখন তুমি কোনো বিষয়ে ইসতিখারা করে ফেলো, তখন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও যে, এখন আল্লাহ তাআলা যে ফায়সালা করবেন, তা কল্যাণকর ফায়সালাই হবে। হতে পারে— বাহ্যদৃষ্টিতে সেই ফায়সালা তোমার কাছে মঙ্গলজনক বোধ হবে না। কিন্তু পরিণতির বিচারে তা-ই মংগলজনক বলে প্রতীয়মান হবে। সেই ফায়সালার যথার্থতা হয়তো দুনিয়ায়ই বোধগম্য হয়ে যাবে, অথবা আখিরাতে যাওয়ার পরে তো সুনিশ্চিতভাবেই জ্ঞাত হবে যে, আল্লাহ তাআলা যে ফায়সালা করেছিলেন, তোমার ক্ষেত্রে তাই কল্যাণকর ছিলো।

ইসতিখারাকারী কখনো ব্যর্থ হয় না

অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন—

ما خاب من استخار، وما ندم من استشار[2]

অর্থাৎ যে বান্দা নিজের বিষয়াদিতে ইসতিখারা করে, সে কখনো ব্যর্থ হয় না। আর যে নিজের কাজকর্মের শুরুতে পরামর্শ করে, সে কখনো অনুতপ্ত হবে না যে, কেনো এ কাজটি করে ফেললাম কিবা কেনো এই কাজটি করলাম না। কেননা সে যা করেছে পরামর্শ করেই করেছে কিবা যা সে করেনি তা পরামর্শক্রমেই করেনি। এজন্য সে কখনো অনুতাপে ভোগবে না।

এই হাদিসে যে বলা হলো, ইসতিখারাকারী কখনো ব্যর্থ হবে না— এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইসতিখারাকারীর পরিণতি অবশ্যই সফলতা ও কামিয়াবি হবে; যদিও কখনো তার মনে এ কথা আসতে পারে যে, যা হলো, বাহ্যত তা তো ভালো বোধ হচ্ছে না। মনে এ কথা জাগা সত্ত্বেও সফলতা ঐ ব্যক্তির নসিবেই জোটবে, যে আল্লাহর তাআলার কাছে ইসতিখারা করে।

আর যে ব্যক্তি পরামর্শ করে কাজ করে, সে কখনো অনুতপ্ত হবে না। কেননা একান্ত যদি সেই কাজটি মন্দ হয়, তখন তার হৃদয়ে এই সান্ত্বনা থাকবে যে, এই কাজ তো আমি আত্মরায়ে হেলায়-খেলায় করে বসিনি, বরং শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ এবং বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করার পরেই করেছি। এখন বাকিটা আল্লাহ তাআলার ওপর হাওয়ালা, তিনি যেভাবে চান, ফায়সালা করবেন।

---

[2] মাজমাউয যাওয়ায়িদঃ ৮/৯৬

এই হাদিসে দুটো বিষয়ের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যখনই কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতায় ভুগবে, তখন দুটি কাজ করবে— আল্লাহর কাছে ইসতিখারা করবে এবং বান্দাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

ইসতিখারার সংক্ষিপ্ত দোয়া

ওপরে ইসতিখারার যে সুন্নত তরিকা বিবৃত হয়েছে, এটা তো তখন, যখন ইসতিখারা করার জন্য বান্দার কাছে পর্যাপ্ত সময় এবং সুযোগ থাকবে। তখন দুই রাকাত নামাজ পড়ে ইসতিখারার উপরিউক্ত দোয়া পাঠ করবে। কখনো এমন পরিস্থিতি আসে যে, দুই রাকাত নামাজ পড়ে সেই দীর্ঘ দোয়া পড়ার মতো সময় পাওয়া যায় না, তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হয়। আচমকা এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে এলে আর দুই রাকাত নামাজ পড়ে উপরিউক্ত দীর্ঘ দোয়া পড়ার মতো সময় না পাওয়া গেলে তখন শুধু রাসুলুল্লাহ সা. নির্দেশিত নিচের দোয়াটি পাঠ করেও ইসতিখারা করা যাবে—

اَللّٰهُمَّ خِرْ لِيْ وَ اخْتَرْ لِيْ[3]

হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনিই পছন্দ করে দিন যে, কোন পথটি নির্বাচন করা উচিত। শুধু এ দোয়াটি পড়ে নিলেই হবে। এছাড়া আরো একটি দোয়া রাসুলুল্লাহ সা. শিখিয়েছেন—

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَ سَدِّدْنِيْ[4]

হে আল্লাহ! আমাকে সথিক পথ প্রদর্শন করুন এবং সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

তেমনই আরেকটি মাসনুন দোয়া—

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ

হে আল্লাহ! সঠিক পথ কোনটা আমার হৃদয়ে তা উদ্রেক করে দিন।

উপরিউক্ত দোয়াগুলোর মধ্যে সেসময়ে যেটা স্মরণ আসে, তা পড়ে নিলেই ইসতিখারা হয়ে যাবে। আরবি দোয়া যদি একান্ত স্মরণ না আসে, তাহলে নিজের ভাষায় এভাবে দোয়া করে নিলেও হবে— হে আল্লাহ! আমি সিদ্ধানের দোদুল্যমানতায় ভুগছি। আপনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। মুখেও যদি বলার মতো পরিস্থিতি না থাকে, তাহলে মনে মনে এ কথা স্মরণ করবে— হে আল্লাহ! এই সমস্যা এবং পেরেশানি দেখা দিয়েছে।

---

[৩] কানযুল উম্মালঃ ৭/১৮০৫৩

[৪] সহিহ মুসলিম, আবওয়াবুয যিকর ওয়াদ দুআ, বাবুত তাআওউয মিন শাররি মা উমিলা

এখন আপনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন; যে পথ আপনার সন্তুষ্ট মোতাবেক হবে এবং যাতে আমার জন্য প্রভূত কল্যাণ নিহিত থাকবে।

মুফতিয়ে আজম রহ. এর আমল

আমি মরহুম আব্বাজান, মুফতিয়ে আজম পাকিস্তান, মুফতি শফি রহ. কে এই আমল করতে দেখেছি, যখনই এমন কোনো পরিস্থিতি আসতো, যাতে তাৎক্ষণিকই সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিতো, সামনে দুটো পথ, এখনই কোনো একটিকে গ্রহণ করে নিতে হবে— এমন পরিস্থিতিতে তিনি কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলতেন। আব্বাজানের আদত সম্পর্কে যাদের জানাশোনা ছিলো না, তারা বুঝতেই পারতো না, চোখ বন্ধ করে তিনি কী কাজ করছেন। হাকিকতে চোখ বন্ধ করে তিনি কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ অভিমুখী হতেন এবং মনে মনেই তাঁর কাছে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমার সামনে এখন দোদুল্যমান অবস্থা। আমি বুঝতে পারছি না, এখন কী ফায়সালা করবো। আপনি আমার দিলে সেই কথা উদ্রেক করে দিন, যা আপনার দৃষ্টিতে কল্যাণকর। মনে মনেই এই ছোট এবং সংক্ষিপ্ততম ইসতিখারা হয়ে যেতো।

প্রতিটি কাজ করার আগে আল্লাহ তাআলার প্রতি অভিমুখী হও

আমার শ্রদ্ধেয় শায়খ ডা. আব্দুল হাই আরেফি রহ. বলতেন, যে ব্যক্তি প্রতিটি কাজ করার আগে আল্লাহ তাআলার প্রতি অভিমুখী হয়, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন। কেননা তোমার ধারণায়ও নেই যে, তুমি এই সামান্য সময়ে কী অসামান্য কাজ করে ফেলেছো। অর্থাৎ সেই সামান্য সময়ে তুমি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে ফেলেছো, তার সঙ্গে তাআল্লুক কায়েম করেছো, তাঁর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করেছো এবং নিজের জন্য সঠিক পথের দরখাস্ত করেছো। এর ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, একদিকে তুমি সঠিক পথেও উপনীত হতে পেরেছো আর অপরদিকে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিদানও প্রাপ্ত হয়েছো এবং দোয়া করার সওয়াবও আমলনামায় যুক্ত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টিকে অত্যন্ত পছন্দ করেন যে, এ ধরনের বিষয়ে বান্দা তাঁর প্রতি অভিমুখী হবে এবং তিনি তাকে সওয়াব ও প্রতিদান দান করবেন। এজন্য মানুষের উচিত আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের অভ্যাস গড়া। সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত এমন কতো পরিস্থিতি সামনে আসে, যাতে বান্দাকে এই ফায়সালা করতে হয়, এই কাজ করবো নাকি করবো না। সে সময়ে একমুহূর্তের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রতি অভিমুখী হও, হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে সে কথা জাগিয়ে দিন, যা আপনার সন্তুষ্ট মোতাবেক হবে।

উত্তর প্রদানের আগে দোয়া করার অভ্যাস

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি রহ. বলতেন, আমার কখনো এর ব্যত্যয় হতো না যে, কোনো লোক এসে বলতো, হযরত! একটা কথা জিজ্ঞেস করবো— তখনই আমি আল্লাহর তাআলার প্রতি অভিমুখী হতাম। কারণ জানা তো নেই, সে কী কথা জিজ্ঞস করবে। আল্লহ তাআলার কাছে দোয়া করতাম, হে আল্লাহ!

আগন্তুক যা জিজ্ঞেস করবে তার সঠিক উত্তর আমার অন্তরে জাগিয়ে দিন। কখনো এই অভিমুখিতা পরিহার করিনি। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্কের ধরন। এজন্য যখনই কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হও, আল্লাহ তাআলার প্রতি অভিমুখী হও।

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফি রহ. বলতেন, ভাই! আল্লাহ মিয়াঁর সঙ্গে কথা বলে নাও। যখনই কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হও, তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করো, তাঁর প্রতি অভিমুখী হও, সে কাজে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়াত কামনা করো এবং এটাকে নিজের জীবনে অভ্যাস বানিয়ে নাও। এ বিষয়টি ক্রমান্বয়ে আল্লহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করে। এভাবে একপর্যায়ে এই সম্পর্ক এতো বেশি শক্তিশালী হয়ে যায় যে, সর্বদা হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থাকে।

আমাদের হযরত আরো বলতেন, পূর্ববর্তী ওলি এবং সুফিগণ যে মেহনত-মুজাহাদা করে গেছেন, কোত্থেকে তাদের অনুরূপ মেহনত-মুজাহাদা করবে?! কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন এক সূক্ষ্ম বিষয় বলে দিচ্ছি, যদি তোমরা তার ওপর আমল করো, তাহলে মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া, ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে অর্জিত হয়ে যাবে। এরপর তিনি উপরিউক্ত কথা বলতেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين